মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

১৫ আগস্ট ২০০৫, সোমবার। ৩১ শ্রাবণ ১৪১২

ভোরের জল্লাদযজ্ঞ

সকাল পাঁচটা। রিভিউ প্যারেড নবদিনের সূচনা। সামরিক কর্তব্য পালন সৈন্যদের মহান দায়িত্ব। বিউগলার মিষ্টি সুরে দিনের বারতা ঘোষণা দিচ্ছেন, দলীয় অধিনায়ক রাষ্ট্রপতি ভবনে নিজ হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াচ্ছেন। ফজরের নামাজ শেষে পাঞ্জাবি খুলে রেখে তিনতলার জানালা দিয়ে সে দৃশ্য অবলোকন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। পাশে দণ্ডায়মান স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা। নিত্যদিনের ঘটনা।
গুড়ুম! গুড়ুম!
বিউগলার লুটিয়ে পড়লেন, পতাকা হাতেই লুটিয়ে পড়লেন কমান্ডার।
হ্যান্ডস আপ!
চারদিক থেকে বেপরোয়াভাবে গুলি করতে করতে জল্লাদ বাহিনী ৩২ নম্বর রোডের ঐতিহাসিক বাড়িতে প্রবেশ করে।
কারা যেন গুলি করছে, বঙ্গজননী আর্তনাদ করে ওঠেন।
সর্বনাশ হয়েছে। আর্মিরা বাড়ি আক্রমণ করেছে, রাষ্ট্রপতি দ্রুত ফোনের কাছে গেলেন। ফোন ওঠালেন। প্রথমেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি। কিন্তু ফোন এনগেজড! তারপর তাজউদ্দিনের বাড়ি জীবনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। না তার ফোন অচল। ফোন করলেন জামিলকে। তিনিও কেবলমাত্র নামাজ শেষ করেছেন:
স্যার।
জামিল, আর্মিরা আমার বাড়ি আক্রমণ করেছে। আমি কাকেও ফোনে পাচ্ছি না।
স্যার, আমি এখনই আসছি।
গোলাগুলির আওয়াজ আর আর্তনাদে ততোক্ষণে বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করছে। প্রাণভয়ে সবাই অস্থির। প্রহরীরা প্রাণপণে জল্লাদদের সঙ্গে লড়াই করছে। আর্মি-পুলিশ সবাই। ওরা প্রাণ দেবে কিন্তু দস্যুদের কাছে মান দেবে না। ভারী অস্ত্রের মুখে তারা টিকতে পারে না, তবু লড়াই চালিয়ে যায়। একে একে ঢলে পড়ে অনেকগুলো তরতাজা কর্তব্যপরায়ণ বাংলার সবুজপ্রাণ। প্রাণ হারালে জল্লাদবাহিনীর শামসুল ইসলাম, আহত হলো কয়েকজন।
তারপর তল্লাশি চালানো হল নিচতলার আনাচে-কানাচে। যেই প্রতিরোধের চেষ্টা করলো সঙ্গে সঙ্গে তাকেই গুলি করা হলো। কুকুর-বিড়াল সবাইকে। এ যেন নির্মম কারবালা হত্যাকাণ্ড!
রাষ্ট্রপতি ফোনে কাকেও পান না নামাজের সময়। হয়তো তারা নামাজ পড়ছেন। ওদিকে গোলাগুলির আওয়াজ বাড়তেই থাকে।
তারা কি চায় আমাকে দেখতে দাও। ঘর থেকে বের হলেন রাষ্ট্রপতি। সিঁড়ি দিয়ে নামবেন নিচে; জল্লাদ মহিউদ্দিন পিস্তল হাতে দণ্ডায়মান। তার পাশে জল্লাদ বজলুল হুদা।
রাষ্ট্রপতি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমরা কি চাও, কি জন্য এসেছো।
তারা স্যালিউট করলেন। দেখামাত্র গুলি করার কথা ভুলে গেলেন। জল্লাদদের হাত কাঁপলো। মেজর মহিউদ্দিনের পিস্তল মাটিতে পড়ে গেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, স্যার আপনাকে নিতে এসেছি।
রাষ্ট্রপতি শান্তভাবে বললেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছো?
না স্যার। চোখ লাল করে কর্কশ কণ্ঠে এবার মেজর বজলু বলেন, আপনাকে নিতেই এসেছি।
এ সময়ে নিচ থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে ওঠে, জল্লাদেরা সবাইকে মেরে ফেলছে!
সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম! গুড়ুম! নিচ থেকে আর্তনাদ ভেসে আসে রাষ্ট্রপতির কানে। তিনি মেজর মহিউদ্দিনের দিকে চাইলেন। দুদিন আগে এই মেজর মহিউদ্দিন জেনারেল জিয়ার একটি বার্তা রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে গিয়েছিল। তিনি এবার মাথানত করেই বললেন, বুঝতেই পারছেন স্যার, অবস্থা ভালো না। দয়া করে আমাদের সঙ্গে চলুন।
ঃ কোথায় যাবো?
ঃ বঙ্গভবন। না না, ক্যান্টনমেন্টে, মেজর বজলুল হুদা জবাব দেয়।
ঃ সেখানে গিয়ে কি হবে, তারচেয়ে তোমরা আমাকে মেরে ফেলো।
ঃ স্যার সময় নষ্ট করবেন না, হুদা রাগান্বিত স্বরে বলে।
ঃ তোমাদের কথায় আমি যেতে পারি না।
ঃ আপনি যদি না যান তবে পদত্যাগ করতে হবে, মেজর মহিউদ্দিন বললেন।
পদত্যাগ করবো, বেশ। রাষ্ট্রপতি চিন্তিত মুখে বললেন।
যে দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেনাবাহিনীর আইনশৃঙ্খলা ও সংবিধান লঙ্ঘন করে, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বাড়িতে গোলাগুলি, আক্রমণ করতে পারে আমি সে দেশের রাষ্ট্রপতি থাকতে চাই না। তবে তোমাদের মতো অধঃস্তন কর্মকর্তাদের কাছে আমি পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারি না। সেনাবাহিনীর চিফ ও ডেপুটি চিফদেরকে এখানে নিয়ে এলে আমি তাদের কাছে আমার পদত্যাগপত্র প্রদান করবো।
মেজর বজলু বললেন, তাহলে আপনাকে ঢাকা বেতারে যেতে হবে এবং বেতারে আপনাকে পদত্যাগ ঘোষণা করতে হবে।
একটু ইতস্তত করে তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি বেতারকেন্দ্রে যেতে সম্মত আছি, তবে শেখ কামালকে আমার সঙ্গে যেতে দিতে হবে।
ঃ তবে চলুন স্যার। মেজর বজলু স্টেনগান তার বুকে তাক করে বললেন।

ঃ চলো, তবে কোনো সিনিয়র অফিসারকে সেখানে আসতে হবে।
ঃ আমরা একজন সিনিয়র অফিসারের নির্দেশেই এসেছি স্যার।
ঃ হু ইজ দ্যাট।
ঃ জেনারেল জিয়া স্যার। আপনি কথা বলে দেখতে পারেন স্যার।
ঃ তাহলে দাঁড়াও।

রাষ্ট্রপতি আবার ওপরে যান। ফোন ওঠান। উপ সেনাপ্রধানের বাসায় ফোন করলেন। কেউ ধরলো না।

ডিজিএফআই প্রধানের বাসায় ফোন করলেন, কেউ ধরলো না। রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে ফোন করলেন, কে একজন অফিসার জানালেন যে, ট্যাংক দিয়ে তাদের ঘেরাও করে রাখা হয়েছে।

এমন সময় তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা তোফায়েল আহমদ ফোন করলেন। রাষ্ট্রপতি বললেন, আমার বাড়ি আক্রান্ত। গোলাগুলি করছে, নিচে অনেককে হত্যা করেছে। যা পারিস কর।

এ সময় তিনি সেনাপ্রধানের ফোন পেলেন। তাঁকে বললেন, সফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধহয় মেরেই ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।

সেনাপ্রধান বললেন, আই অ্যাম ডুইং সামথিং, ক্যান ইউ গেট আউট দি হাউস?

রাষ্ট্রপতি কিশোরগঞ্জের ধসুদল গ্রামের ১২-১৩ বছরের ছেলে আবুল কালাম ভুঁইয়ার কাছ থেকে পাঞ্জাবি নিয়ে গায়ে দেন এবং তার প্রিয় পাইপটি নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। মেজর ফারুক তখন রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে ট্যাংক মোতায়েন করে বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছে। মেজর রশীদও তার মিশন শেষ করে সেখানে উপস্থিত তার দলবলসহ।

এ সময়ে তিনতলা থেকে নেমে শেখ কামাল দৌড়ে নিচে যেতে থাকে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে আর্টিলারি নায়েব সুবেদার আবুল বাশার, নায়েব রিসালদার সারোয়ার হোসেন, দফাদার নুরুজ্জামান ও আরো কয়েকজন। শেখ কামালের সঙ্গে আরো গুলি লাগে পি এ রহমানের গায়ে।

ওদিকে মেজর বজলুল হুদা, মেজর নুর এক একটি ঘরে লোক খুঁজে দেখছে। মেজর মহিউদ্দিন আবার বললেন, স্যার আপনি নেমে আসুন। মেজর ফারুক সিঁড়ির কাছে যেতেই দেখেন বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। এবার গর্জে উঠলেন, কি চাও ফারুক। তোমরা আমাকে খুন করতে এসেছ? ভুলে যাও, পাক আর্মিরা এটা পারেনি। তোমরা কি মনে করো তোমরা পারবে?

ফারুক অস্ত্র নামিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আপনি নেমে আসুন স্যার।

রাষ্ট্রপতি বললেন, তোরা আমাকে জাতির পিতা বানিয়েছিস, আজ আবার আমাকে মারতে এসেছিস।

মেজর মহিউদ্দিনের মতো মেজর ফারুকও কাঁপতে থাকেন। মনে হচ্ছিল তার হাত থেকে পিস্তল পড়ে যাবে।

ফারুক আবার বললেন, আপনি নেমে আসুন স্যার।

রাষ্ট্রপতি বললেন, তোদের কথায় আমি যাব? তোরা কি ভেবেছিস? এভাবে আমার দেশকে আমি ধ্বংস হতে দেব না। আমি ক্ষমতা চাই না। আর্মিরা যদি দেশ চালাতে পারে ক্ষমতা নিয়ে নিক। জেনারেলরা কোথায়?

মেজর মহিউদ্দিন বললেন, তারাই আমাদের পাঠিয়েছেন।

তারা কে? রাষ্ট্রপতি ধমক দিলেন, তারা আসতে পারলো না।

আপনি গেলেই দেখতে পাবেন স্যার। জেনারেল জিয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মেজর মহিউদ্দিন থেমে গেলেন। গলা যেন তার বন্ধ হয়ে আসছে। তাদের মিশন যেন ব্যর্থ হতে চলেছে।

এমন সময় একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি। একটি গুলি এসে শেখ নাসেরের হাতে লাগলো। বেগম মুজিব আবার আর্তনাদ করে উঠলেন। শাড়ি ছিঁড়ে তার হাত বেঁধে দিলেন। সিঁড়ি থেকে রাষ্ট্রপতি তার সবকিছু দেখতে পেলেন এবং স্ত্রীর কণ্ঠ শুনতে পেলেন।

মেজর ফারুকের পাশে এসে দাঁড়ান মেজর শরিফুল হক। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ এতো দেরি হচ্ছে কেন?

মেজর ফারুক অসহায়ভাবে তার দিকে তাকান। শরিফুল বললো, বঙ্গবন্ধু যদি আর ৫ মিনিট জীবিত থাকেন, তাহলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এখনই তাকে শেষ করে ফেল।

তার বলার সঙ্গে সঙ্গে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, নায়েব রিসালদার সারোয়ার হোসেন স্টেনগানের ৬৪টি গুলি করেন।

ইয়া আল্লাহ, বাংলাদেশকে রক্ষা করো বলেই রাষ্ট্রপতি পড়ে গেলেন। বিশাল দেহখানি তাঁর সিঁড়ির ওপর পড়ে রইল তাঁর মাথা পড়ল নিচের দিকে।

সময় তখন সকাল ৫টা ৪০ মিনিট। বাঙালি জাতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রচণ্ড ভালোবাসার চিরতরে অবসান ঘটল। ফারুক মিনিটখানেক দাঁড়ালেন। তারপর অপারেশন কক্ষে উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষমাণ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বললেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা বেতারে যাচ্ছি।

ফোন রেখে ঘর থেকে বের হতেই মেজর রশীদ ফোনে তার আংকেল মোশতাককে বললেন, মুজিবসহ সবাইকে খুন করা হয়েছে। আমি আসছি।

আর ওদিকে দরজা খোলাই ছিল। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর নুর কতিপয় জল্লাদ নিয়ে ওপরে উঠে মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে চালাতে থাকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় বেগম মুজিবকে নায়েব রিসালদার সারোয়ার হোসেন গুলি করে। দুই পুত্রবধূকে একই কামরায় গুলি করে দফাদার নুরুজ্জামান (কুমিল্লা)। বড়ো বউ রাজিয়া সুলতানার হাঁটুতে গুলি লেগেছিল। সে দিনের নটা পর্যন্ত জীবিত ছিল। সে অনেক মিনতি করেছিল যে আমাকে আপনারা চিকিৎসা করান, আমি বেঁচে যাব এবং আমি সারাজীবন আপনাদের নার্স হিসেবে চাকরি নিয়ে সেবা করবো। আমার গর্ভে ৫ মাসের বাচ্চা। আমাকে আপনারা বাঁচান। কিন্তু নটার সময় বেঙ্গলের এক হাবিলদার তার পেটে গুলি করে।

রাষ্ট্রপতির ছোট ছেলে রাসেল (৮) মায়ের হাত ধরে ভয়ে কাঁপছিল। জল্লাদেরা তার মাকে হত্যা করলে রাসেল বলে, আমি তো পৃথিবীর

কারো কাছে অন্যায় করিনি। তার কথায় সুলতানা বলে, তুমি কাদের কাছে ফরিয়াদ করছো। আমাদের কাছে এসো, রাসেল দৌড়ে দুই ভাবীর কাছে যায়।

কামাল, বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবকে হত্যার পর সুলতানার ধারণা ছিল জল্লাদরা তাদের মারবে না। তাই রাসেলকে তাদের কাছে যেতে বলেছিল। কিন্তু জল্লাদদের পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধুর বংশের কাকেও বাঁচিয়ে রাখবে না। দুই বৌকে আলাদা করে গুলি করে হত্যা করে। রাসেল এক ফাঁকে দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধ দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকদের কাছে আশ্রয় নেয়। দীর্ঘদিন যাবত দেখাশুনার ছেলে রমার কাছ থেকে রাসেলকে ছিনিয়ে নেয়। রাসেল ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, আল্লাহর দোহাই আমাকে জানে মারবেন না। বড়ো হয়ে আমি আপনাদের বাসায় কাজের ছেলে হিসেবে থাকবো। আমার হাসু আপা, দুলাভাইয়ের সঙ্গে জার্মানিতে আছে। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আপনারা আমাকে জার্মানিতে হাসু আপা ও দুলাভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। তখন উক্ত সৈন্যটি রাসেলকে বাড়ির গেটস্থ সেন্ট্রির কাছে লুকিয়ে রাখে। এর প্রায় আধঘণ্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ১৮টি গুলি করে হত্যা করে।

একজন পুলিশ অফিসার মাসুম বাচ্চা বলে রাসেলের জীবন ভিক্ষা চান। ঐ অফিসারকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়। এ সময় গুলিতে রাসেলের একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনো সে আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না, বলে চিৎকার করছিল। শিশু রাসেলের সে চিৎকারে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলেও জল্লাদদের মনে কোনো করুণার উদ্রেক হয়নি।

সবচাইতে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছিল শেখ মনির স্ত্রীকে। কারণ তার গুলিতে আর্টিলারির একটা ছেলে মারা গিয়েছিল। তাই তার স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে থ্রি ও ব্রোনিং মেশিন গানের ব্যারেল ঢুকিয়ে ৫/৬ জনে ধরে কমপক্ষে ৬০/৭০ রাউন্ড গুলি করেছিল।

ফারুক রশীদ চলে যাওয়ার পর জল্লাদেরা পুরো বাড়িটা এক এক করে তল্লাশি চালায় এবং মূল্যবান সবকিছু লুটে নেয়। প্রতিটি আলমারি, ড্রয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ভেঙে ফেলে।

বঙ্গবন্ধুর ছেলের বউ-এর মুকুট আর্টিলারির ২ জন ভাগ করে নিয়েছিল। তখনই মেজর ফারুক তাদের গুলি করে মেরে ফেলে। কিন্তু আর্টিলারির এস এম আনিসুর রহমান একটা ক্যাসেট নিয়ে যায় আর রিসালদার সারোয়ার বেগম মুজিবের নেকলেস নিয়ে নেয় এবং দফাদার বদরুল নেয় বঙ্গবন্ধুর হাতে ঘড়ি। বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ নাসের প্রাণের ভয়ে বাথরুমে লুকিয়ে ছিলেন। আর্মিরা তাকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে।

লেঃ শেখ জামালের করুণ মৃত্যু

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনীর। গড়লেন সশস্ত্র বাহিনী, প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী। মেজ ছেলে শেখ জামালকে অনুপ্রাণিত করলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করতে। শেখ জামাল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেন এবং ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করলেন। আর তখন থেকেই স্বাধীনতা বিরোধীপক্ষ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ প্রচার শুরু করলেন যে, কিছুদিনের মধ্যে শেখ জামাল সশস্ত্র বাহিনীর নামমাত্র প্রধান সেনাপতি হবেন, আসল ক্ষমতা থাকবে ভারতের হাতে। এ নিয়ে সাধারণ সৈন্যরা বিভ্রান্ত হলেন।

১৪ আগস্ট রাতে পারিবারিক অনুষ্ঠান শেষ করে লে. জামাল বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে ইউনিটে ফিরে গেলেন। ইউনিটের অনুষ্ঠান ছিল ঢাকার একটি হোটেলে। সেখানেই একটি কামরায় রাত বারটায় তাঁর গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মারলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের তদানীন্তন টু আই সি। সেখান থেকে তার লাশ বেঙ্গল ল্যান্সারের টয়লেটে রাখা হয়। মেজর ফারুক নিজের তত্ত্বাবধানে তা একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে সকালবেলা বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে রাখলেন। কি নিষ্ঠুর নিয়তি, কি নির্মম পরিহাস। দেশের রাষ্ট্রপতি তখনো জীবিত। রাষ্ট্র ক্ষমতা তখনো তাঁর হাতে। স্বাধীন বাংলার সবচেয়ে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিত্ব। অথচ তারই সন্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় বিনা অপরাধে নিহত হলেন। তার বিচার হলো না

শেখ মনির বাড়ি

মেজর রশীদ তার দল নিয়ে শেখ মনির বাড়ি যায় এবং শেখ মনি ও তার স্ত্রী বেগম শামসুন্নেসা মনিকে হত্যা করে। মনি ও বেগম মনিকে হত্যা করে দফাদার বারী (নোয়াখালিতে পেনশনে আছে), দফাদার মতি (বগুড়া, পেনশনে) ও দফাদার সাইদুর (বগুড়া, পেনশনে)।

মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবত

দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গলের টু আই সি (উপ-অধিনায়ক)-এর দল যায় তাঁর বাড়ি এবং সেখানে হত্যা করে আবদুর রব সেরনিয়াবত, বেবী সেরনিয়াবত, আরিফ সেরনিয়াবত, বাবু সেরনিয়াবত, নান্টু এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন কর্মচারীকে। সেরনিয়াবতের বাড়িতে যারা আহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন বেগম রব সেরনিয়াবত, বেগম আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, বিউটি সেরনিয়াবত, আবুল খায়ের আবদুল্লাহ, হেনা সেরনিয়াবত।

বিশ্বস্ত সৈনিক

একদিকে মোনাফেক মীরজাফর জল্লাদদের হত্যাযজ্ঞ আর উল্লাস উম্মাদনা আর একদিকে সেনাপ্রধানের অসহায়ত্ব, সিজিএসের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, ব্রিগেড কমান্ডারের সিদ্ধান্তহীনতা, সৈন্যদের নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা। আর এতোসবের মধ্যেও নির্ভীক নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণ বীর জামিল, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে শোনামাত্র সেনাপ্রধানকে ফোনে জানিয়ে তার রাষ্ট্রপতিকে রক্ষার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি অভিমুখে। জল্লাদ বাহিনীর শত নিষেধ সত্ত্বেও তার দায়িত্ব পালনে এতোটুকু কার্পণ্যতা করেননি। কাণ্ডজ্ঞানহীন জল্লাদেরা গুলি করে তাঁর গতি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। কিন্তু কর্নেল জামিল নিজের প্রাণ দিয়ে তার বিশ্বস্ততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে যেভাবেই মূল্যায়ন করুক না কেন, কর্নেল জামিলের আত্মত্যাগ তাকে বঙ্গবন্ধুর মহান জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে অমরত্ব দান করেছে।

বঙ্গবন্ধু ভবনে লাশ আর লাশ

'দেয়ালে বেশকিছু গুলির দাগ। নিচের তলায় রিসেপশন রুমে দুজনের মৃতদেহ পড়েছিল। একজন শেখ কামাল আর একজন পুলিশ অফিসার।'

দ্বিতীয় তলায় সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়েছিল। তাঁর পরিধানে ছিল পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি। তাঁর দেহ সিঁড়ির ওপরে এমনভাবে পড়েছিল মনে হচ্ছিল যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হঠাৎ পা পিছলে পড়েছেন। তাঁর মুখে কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। চেহারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁর বুকের

ওপর ডান হাতটা ভাঁজ করা। বুকের অংশটুকু ছিল সম্পূর্ণ রক্তাক্ত। রক্তের আবিরে দেখা যাচ্ছিল না। তবে তর্জনী আঙুলটি ছিঁড়ে গিয়ে চামড়ার টুকরার সঙ্গে ঝুলছিল। তাঁর দেহের অন্য কোনো অঙ্গে তেমন কোনো আঘাত লাগেনি।

দোতলার সিঁড়ির কাছের ঘরটাতেই বেগম মুজিবের দেহ দেউড়িতে উপুড় হয়ে পড়েছিল। তার গলার হারটা ঢুকে ছিল মুখের মধ্যে। কামরার ভিতর শেখ জামাল এবং তার নব বিবাহিতা স্ত্রী রোজী জামালের দেহ। ব্রাশ অথবা গ্রেনেডের আঘাত সরাসরি তার মুখে লেগেছিল। তার পাশে মিসেস কামাল। প্রচুর রক্তক্ষরণে তার চেহারা সম্পূর্ণ বিবর্ণ শুকনো। তার কোল ঘেঁষে ছোট্ট রাসেলের মৃতদেহ। করুণ দেখাচ্ছিল তার মুখ।

নিচের তলায় বাথরুমে শেখ নাসেরের মৃতদেহ পড়েছিল। বাড়ির পিছনের আঙিনায় একটি লাল গাড়িতে পড়েছিল কর্নেল জামিলের মৃতদেহ। বুলেট লেগেছিল ঠিক তার কপালে।

মেডিকেল কলেজের মর্গে রব সেরনিয়াবত ও শেখ মনির লাশ

পনের আগস্ট নিহত আবদুর রব সেরনিয়াবত, শেখ মনি ও তাঁদের পরিবারবর্গের মৃতদেহগুলো সৈন্যরা একত্রে গাদাগাদি করে অযত্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে নিয়ে গিয়েছিল। পচে দুর্গন্ধ হয়েছিল।

দাফন ব্যবস্থা

১৬ আগস্ট, হত্যাকাণ্ডের একদিন পর রাত তিনটায় বঙ্গভবন থেকে মেজর মতি ফোন করে ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার লেঃ কর্নেল আব্দুল হামিদকে মৃত লাশগুলো (বঙ্গবন্ধু ছাড়া) বনানী গোরস্থানে দাফনের নির্দেশ দেন। তদনুসারে কর্নেল হামিদ ঢাকা সেনানিবাসের ডিউটি ইউনিট ১নং সাপ্লাই ব্যাটেলিয়নকে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালনে নিয়োজিত করেন। তিনি একটি দলকে লাশ সংগ্রহের জন্য পাঠান আর ৩০ জনের একটি দলকে কবর খননের জন্য পাঠান। কর্নেল হামিদ বঙ্গবন্ধু ভবনের লাশ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের লাশগুলো চিহ্নিত করেন। তিনি লাশগুলো বনানী কবরস্থানে ১৪টি কবরে দাফন করেন; প্রথম কবরটি বেগম মুজিবের, দ্বিতীয়টি শেখ নাসেরের, তৃতীয়টি শেখ কামালের, চতুর্থটি বেগম কামাল, পঞ্চমটি শেখ জামালের, ষষ্ঠটি বেগম জামালের এবং সপ্তমটি মাস্টার রাসেলের

বঙ্গবন্ধুর দাফন

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অনেক সময় তাঁর লাশ অবহেলা অযত্নে পড়েছিল। জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু আরো বিপজ্জনক হতে পারেন আশংকায় অভ্যুত্থানকারীরা ঢাকায় দাফন না করে তাঁর লাশ টুঙ্গীপাড়ায় তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার সিদ্ধান্ত নেন। তদনুসারে ঢাকার এসপি আব্দুস সালাম অয়্যারলেসে গোপালগঞ্জের এসডিপিও মোঃ নূরুল আলমকে দাফন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং ঢাকা থেকে এগারোটায় হেলিকপ্টারে লাশ যাবে বলে জানান। অতঃপর বাঁশবাড়ীয়া ও টুঙ্গীপাড়া থানার সব ফোর্স সেখানে মোতায়েনপূর্বক দাফন কাজ সমাধা করেন। বেলা দেড়টা নাগাদ হেলিকপ্টার সেখানে পৌঁছে। ৩০ জন পুলিশ, এসডিপিও, একজন ম্যাজিস্ট্রেট, মেজর মহিউদ্দিন ও মেজর বাশার, ১০/১২ জন আত্মীয়-স্বজন, মসজিদের ৩/৪ জন মুসল্লি, কবর খননের লোক ও গোছলের লোক জানাজায় দাঁড়িয়েছিলেন। মেজরদ্বয় বাকি লোকদের শামিল হতে দেয়নি। জোর করে তৃতীয় কাতারে শামিল হন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল কাদের ও সার্কেল ইন্সপেক্টর আব্দুর রহমান। জানাজা শেষ হলে বঙ্গবন্ধুর দূর সম্পর্কীয় এক চাচাকে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

বাড়ির মধ্যে থেকে একজন মহিলা চিৎকার করে মুখ দেখতে চাইলে দেখানো হয়। বেলা আড়াইটায় বঙ্গবন্ধুর দাফন কাজ শেষ হয়।

যাঁকে কেন্দ্র করেই আধুনিক ঢাকার উত্থান, ঢাকার মাটিতে তাঁরই দাফনের ঠাঁই হলো না। বাঙালির এও এক করুণ আর্তনাদ। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বঙ্গবীর ওসমানী বলেন, ফরাসিরা একশ বছর পরে নেপোলিয়নের লাশ প্যারিসে পুনঃস্থাপন করেছেন। বাঙালিরা একদিন বঙ্গবন্ধুর কবর ঢাকায় পুনঃস্থাপন করবে। তাঁর কবর বাঙালির শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে পরিণত হবে। তারা মীরজাফরের মতো ভার্ক হর্সের কবর গুঁড়িয়ে দেবে।